মরণের মুখে - অজেয় রায় Moroner Mukhe by Ajeo Ray

এক

সকাল দশটা নাগাদ।

ভবানী প্রেসের সামনে সাইকেল থেকে নামল দীপক। একবার টু মেরে যাই সম্পাদকের ঘর।

ভবানী প্রেসের এক কোণে সাপ্তাহিক বঙ্গবার্তার ছোট্ট অফিসঘর। দীপক দরজা ঠেলে মুখ বাড়াতেই সম্পাদক কুঞ্জবিহারী মাইতি যথারীতি গমগমে গলায় আহ্বান জানালেন -“এসো দীপক।।

দীপক ঢুকল। কুঞ্জবাবুর সামনে এক ভদ্রলোক বসেছিলেন চেয়ারে। ছোটখাটো চেহারা। ফরসা রং। মানুষটিকে দেখেছে দীপক, তবে পরিচয় নেই। কুঞ্জবিহারী বললেন দীপককে, 'কি কোনো ইন্টারেস্টিং নিউজ আছে? কয়েক হপ্তা মোটে ভালো স্টোরি যাচ্ছে।

সেই থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়।

দীপক চেয়ারে বসতে বসতে মিনমিন করে—‘নাঃ তেমন কিছু নেই। শুধু ওই হনুমানের বিয়ে দেখা। ‘কী রকম?’ নড়েচড়ে বসেন কুঞ্জবিহারী।

গত শুক্রবার মানে তিন দিন আগে নানুরের কাছে একটা বিয়ে ছিল। কী সব স্ত্রী-আচার হচ্ছিল সকালে। হঠাৎ কোথেকে একটা গোদা হনুমান একদম ঘাড়ের কাছে। পাঁচিলে বসে ঝুঁকে পড়ে দেখতে থাকে ব্যাপার। ভয় পেয়ে সব মেয়েরা মায় কনেসুষ্ঠু । মারে ছুট। ছেলেরা লাঠিসোটা দেখিয়ে হনুটাকে তাড়ায়। কিন্তু সে বেটা নাছোড়বান্দা। ওইসব অনুষ্ঠান যেখানেই হয় ঠিক গিয়ে উকি দেয়। শেষে লোকে হাল ছেড়ে দেয়। থাকুকগে। ওকে আর ডিসটার্ব করে না। হনুমানটাও কোনো গোলমাল করে না। খুঁটিয়ে দেখে সব। বিকেলে ওকে কিছু কলা-মুলো দেওয়া হয় খেতে। হাজার হোক নেমন্তন্নবাড়ি। তাই দিয়ে তৃপ্তিসহ ভোজ সেরে হনুটা বিদায় নেয়। লোকে বলছে ও নাকি আশীর্বাদ করে গিয়েছে। বর-কনের মঙ্গল হবে। এই নিয়ে খুব গুজব ছড়াচ্ছে। কাল খবর নিতে গিয়েছিলাম নানুরে।

কুঞ্জবিহারী তার ঝাটার মতো গোঁফজোড়া নাচিয়ে বললেন, “হুম ইন্টারেস্টিং। একটা স্টোরি করে দাও। দেখচ, অন্য জীবদের মানুষ সম্বন্ধে কেমন কৌতূহল।'

সম্পাদকের সামনে বসা ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'কেন থাকবে না মশাই? মানুষের যখন অন্য জীবজন্তু নিয়ে এত মাথাব্যথা! ওঃ, কত রকম মানুষ যে হয়। এই তো ক'দিন আগে একজনের সঙ্গে আলাপ হল। ভদ্রলোকের শখ হচ্ছে সাপ। দিনরাত সাপুড়েদের কাছে ঘুরঘুর করেন। আবার সাপ পোষেন। উদ্ভট খেয়াল। ইস সাপ মশাই আমি দু'চক্ষে

মরদেয় মুখে।। ৩০৩ এরি না। এই নিয়ে আবার কেউ রিসার্চ করে! এর চাইতে নানুরের ওই হনুমান

দেখতে পারি না। এই

তিনি কোথায় থাকেন? কী নাম?' কৌতূহলী দীপকে প্রশ্ন।

সালোক দীপকের দিকে চেয়ে একটু ইতস্তত করতে কুঞ্জবাবু বললেন—আলাপ করিয়া দিই। এর নাম বগলাচরণ দত্ত। আর এ হচ্ছে দীপক রায়। বঙ্গবার্তার একজন রিপোর্টার।।

দীপক ও বগলাচরণ পরস্পরে নমস্কার জানায়। তারপর বগলাবাবু বলেন

‘সেই ভদ্রলোক থাকেন সিয়েনের কাছে। বীরভূমের লোক নন। বাইরের লোক। সিয়েনের কাছে একটা বাসা ভাড়া করে রয়েছেন কিছুদিন। সাপ আর সাপুড়ের খোঁজে বীরভূমের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। গোটা পশ্চিমবঙ্গেই নাকি ঘুরছেন এই উদ্দেশ্যে। নাম বললেন, হরিবাবু। হরিহর নাগ। নাগ বংশীয় কিনা, তাই বোধহয় সর্পকুলের ওপর এত টান। খিকখিক করে হাসেন বগলাচরণ।

‘‘কি, হরি নাগের একটা ইন্টারভিউ নেবে নাকি?' সম্পাদকের মন্তব্য। ‘তাই ভাবছি', দীপক মাথা ঝাকায়। ‘বেশ, লেগে যাও।' সম্পাদক উৎসাহ দিলেন, ‘ইন্টারেস্টিং কিছু পেতেও পার।' সম্পাদকের কথাগুলো মনে রেখে দীপক বিদায় নেয়।

দুই

হরিহর নাগ যে বাসায় থাকেন সেটা গ্রামের এক প্রান্তে। বহু পুরনো দোতলা পাকাবাড়ি। বাড়ির চারধারে অনেকখানি এলাকা। এখন বড় বড় গাছ আর ঝোপ-জঙ্গলে ভরা। পুকুরটা মজে গিয়েছে। একসময় ধনী সরকার পরিবারের বাস ছিল বাড়িটায়। তবে এখন গোটা বাড়ি ফাকা পড়ে থাকে প্রায় বছরভর। পরিবারের সবাই প্রায় গ্রাম ছেড়েছে। চাষের জমিও প্রায় সমস্ত বিক্রি করে দিয়েছে। শুধু প্রাচীন গৌরবের সাক্ষীস্বরূপ জীর্ণ বাড়িটা টিকে আছে কোনোরকমে। সরকারদের একটি পরিবার এখনও আছে বটে ভিটে আগলে কিন্তু তারা থাকে পুরনো বাড়ি থেকে খানিক তফাতে। মাটির বাড়ি বানিয়ে নিয়েছে। পুরনো বাড়িখানার যা দশা, কোনোদিন না ভেঙে পড়ে ছাদ। তাছাড়া এতকাল বাকা পড়ে থাকায় ভূতুড়ে বলেও কিঞ্চিৎ বদনাম হয়েছে সরকার বাড়ির। হরিবাবু সরকারদের এই পাকাবাড়ির নিচের তলায় কয়েকটা ঘর নিয়েছেন নামমাত্র ভাড়ায়। সাফ করে থাকছেন। ওঁর ভূত বা সাপখোপের ভয় নেই। একদম একা থাকেন না অবিশ্যি। কালুয়া বলে একটি লোক থাকে সঙ্গে। কালুয়া জাতে সাপুড়ে। ওর বাড়ি নাকি বীরভূমেই। লাভপুরে। হরিবাবুর সঙ্গে এসেছে। সে হরিবাবুর কাজকম্ম করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ঘোরেও। সাপুড়ে বলেই কালুয়ার সাপ সম্পর্কে ভয়ডর নেই। নইলে যে সাপ পোষে তার সঙ্গে অন্য লোক কেউ থাকত না।

হরিবাবু সম্বন্ধে এসব জানল দীপক গ্রামের লোকের মুখে। বঙ্গবার্তা দফতরে হরিহর নাগের কথা শোনার কয়েকদিন বাদে এক দুপুরে সে হাজির হয় হরিবাবুর বাসায়। হরিবাবু তখন বাড়িতে ছিলেন না। কেউ ছিল না বাসায়। ঘর তালা বন্ধ।

দীপক ফিরে যায়নি। এই অবসরে সে গ্রামে ঘুরে হরিবাবু এবং সরকার বাড়ি সম্বন্ধে কিছু খবর জোগাড় করল। তবে গায়ের লোকের হাবভাব দেখে তার একটা সন্দেহ হল যে এই আগন্তুককে গাঁয়ের লোক বিশেষ পছন্দ করে না। হয়তো বা হরিবাবুর উদ্ভট খেয়ালের কারণে। গ্রামের মান্যগণ্যরা বেশ একটা অবজ্ঞা ও বিরক্তির ভাবই প্রকাশ করল হরিবাবু সম্পর্কে। তবে সোজাসুজি কোনো বদনাম দিল না কেউ। হরিবাবুর চেয়ে হরিবাবুর সঙ্গী কালুয়া সম্পর্কেই মনে হল। গাঁয়ের অপছন্দ বেশি। কারণটা ঠিক ধরতে পারে না দীপক।

হরিবাবু ফিরলেন বিকেলে।

বগলাচরণের মুখে যা বর্ণনা শুনেছিল তাই মিলিয়ে হরিবাবুকে আন্দাজ করে দীপক। লম্বা রোগা। পাকানো শরীর। বয়স বছর চল্লিশ। লম্বাটে মুখ। রোদে পোড়া শ্যামবর্ণ। খাড়া নাক। চাপা ঠোট। রগের চুলে একটু পাক ধরেছে। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। পায়ে রবারের জুতো। কাধে একটা চটের ব্যাগ।

গ্রীষ্মের পড়ন্ত বেলায় মেঠো পথ বেয়ে বড় বড় পা ফেলে এলেন ভদ্রলোক। তার বেশ খানিকটা পিছনে আসছিল আর একজন। লোকটির কাধে একটা বড়সড় থলে।

ভদ্রলোক সরকার বাড়ির জঙ্গুলে এলাকায় ঢোকার মুখে দীপক এগিয়ে গিয়ে হাতজোড় করে বলল, 'নমস্কা। আপনি কি শ্রীহরিহর নাগ?

ভদ্রলোক থমকে গিয়ে বললেন, হ্যা। ‘‘আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম। আপনি নাকি সাপ নিয়ে রিসার্চ করছেন?'

‘‘আপনি?’ হরিহরবাবু ভুরু কোচকান।

‘আমার নাম দীপক রায়। রিপোর্টার।

‘কোন কাগজ?'

সাপ্তাহিক বঙ্গবার্তা।

বঙ্গবার্তা? কোথা থেকে বেরোয় ?

‘বোলপুর। আপনার একটা ইন্টাভিউ নিতে চাই।

আমার কথা শুনলেন কোত্থেকে?”

“শুনেছি,' রহস্যময় হাসে দীপক, রিপোর্টারদের চোখ-কান খোলা রাখতে হয়।”

হরিহরবাবু গম্ভীর মুখে বললেন, “রিসার্চ গবেষণা অত বড় ব্যাপার আমি করি না। সাপ নিয়ে সামান্য কিছু স্টাডি করছি। জীবজন্তু নিয়ে আমার চিরকালই আগ্রহ। আপাতত সাপ নিয়ে পড়েছি। হু, যদি সাবজেক্টটা আরও সময় দিতে পারি, নতুন কিছু পাই, ইচ্ছে আছে একটা বই লিখব। শুধু সাপ নিয়ে নয়, সাপুড়েদের নিয়েও।'

‘আপাতত যা জেনেছেন তাই নিয়েই বলুন কিছু।

হরিহর রুক্ষস্বরে বললেন, 'মাপ করবেন। প্রেসকে এখন আমি ইন্টারভিউ দেব না। এই বিষয়ে অনেক পণ্ডিত আছেন। ভুলভাল কিছু বলে ফেললে এক্সপার্টরা আমার রক্ষা। রাখবেন না। সমালোচনা করে তুলো ধুনে দেবেন। আমি শখ করে এই নিয়ে মেতেছি। এখুনি সিরিয়াস ঝামেলায় জড়াতে চাই না।'

হরিহর সোজাসুজি ইন্টারভিউ দিতে নারাজ বুঝে দীপক কথা ঘোরায়। ‘আপনি কলকাতায় থাকেন?”

‘না। ব্যারাকপুরে। চব্বিশ পরগনা।

‘চাকরিতে ছুটি নিয়ে এই শখ মেটান বুঝি?

চাকরি করি না। ব্যবসা করি। মাঝে মাঝে ব্যবসা থেকে ছুটি নিয়ে শখ মেটাই।

‘আপনি কি সাপ পোষেন?”

“ঠিক পোষ মানাবার চেষ্টা করি না। তবে কিছুদিন রাখি নিজের কাছে।'

“কেন?”

‘তাদের ধরন-ধারণ স্টাডি করি বন্ধ ঘরে ছেড়ে দিয়ে। “বিষাক্ত সাপ?”

‘আপনি সেই ঘরেই থাকেন?”

‘থাকি কখনও কখনও।'

‘ডেঞ্জারাস। যদি কামড়ে দেয়?

“অবশ্যই বিষ বের করা সাপ। তাই কামড়ালেও মরি না।” ‘আপনি সাপ ধরতে পারেন?

সাপ পান কোত্থেকে?'

কিনি সাপুড়েদের থেকে।

‘বিদাত কামাতে পারেন?

না।”

‘তাহলে?”

'কখনও সাপুড়েরা কামিয়ে দেয়। কখনও কালুয়া কামায়।

‘কালুয়া মানে আপনার ওই সঙ্গী?”

‘হু। ওর খবরও পেয়েছেন দেখছি। কালুয়া জাতে সাপুড়ে। সাপ ধরতে পারে। বিষ ঝাড়তে পারে। তাই এ কাজে ওকে নিয়ে ঘুরি।'

কালুয়া নামে হরিহরবাবুর সঙ্গীটি খানিক তফাতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে একটুক্ষণ লক্ষ করেছিল দীপককে। তারপর হরিবাবু ইঙ্গিত করতেই সে ধীরপায়ে বাড়ির পিছন দিকে চলে যায়।

কালুয়ার চেহারা বা ধরন-ধারণু বেশ অদ্ভুত। মোর কালো রং। মাথায় ঝাকড়া বাদামি চুল। পুরুষ্ট পাকানো গোঁফ। মাঝারি লম্বা। দারুণ গাট্টাগোট্টা। মুখ ভাবলেশহীন কঠিন। খুদে খুদে তীক্ষ চোখ! গায়ে ধুতি ও হাওলা গেঞ্জি। খালি পা।

‘আচ্ছা সাপগুলো কিনে কিছুদিন রেখে মানে অবসার্ভ করে তারপর কী করেন? বিক্রি করে দেন?'

‘না। বিক্রি করি না। ছেড়ে দিই।

‘ মানে?

হ্যা, ছেড়ে দিই। তাদের বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে দিই। ঝোপেঝাড়ে মাঠে ছেড়ে দিই।'

দীপক অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

হরিহরবাবু বলেন, ‘‘দেখুন আমি একজন অ্যানিমাল লাভার। জীবজন্তুকে বন্দি কর রাখা আমি অন্যায় বলে মনে করি। তারা ভারি কষ্ট পায়। ভাবুন তো জেলে আটকে রাখলে মানুষের কত বড় শাস্তি! যথেষ্ট আরামে রাখলেও। তবু বাধ্য হয়ে আমরা চিড়িয়াখানা বানাই। আর সাপুড়েরা যে সাপগুলোকে রাখে ঝাপির মধ্যে সারাক্ষণ, কী কষ্ট তাদের। মোট নড়াচড়া করতে পারে না। এটা আইন করে বন্ধ করা উচিত। কিন্তু তাহলে আবার সাপুড়েরা ভাতে মরবে। উভয়ই সমস্যা।'

দীপক পুলকিত হয় হরিহরবাবুর কথায়। সে নিজেও জীবজন্তু খুব ভালোবাসে। বন্দি প্রাণী দেখলে কষ্ট পায়। তাই হরিবাবুর ব্যথা সে বোঝে। বলে, ‘‘ঠিকই বলেছেন। | হরিহরবাৰু উৎসাহিত হয়ে আরও বলেন, ‘‘দেখুন সাপুড়েদের ঝাপিতে দিনের পর দিন জড়সড় হয়ে থেকে সাপেদের আয়ু কমে যায়। বেশিদিন বাঁচে না বেচারিরা। অনেক সময় বন্দি মৃতপ্রায় সাপকে সাপুড়ে নিজেই ছেড়ে দেয়। তবে সে বড় শেষ সময়ে। আমি তার আগেই কিনে নিই খানিক তাজা সাপ। কয়েকদিন নিজের কাছে রেখে স্টাডি করে ছেড়ে দিই তাদের, যাতে তারা আরও বেশ কিছুকাল বাঁচতে পারে। দুটো উদ্দেশ্যই সফল হয়। আমার ক্ষুদ্র সামথ্যে যেটুকু করা যায় আর কী।'

সদ্য ধরা একদম তাজা সাপ কিনে ছাড়লে তো আরও ভালো হয়। দীপক প্রস্তাব দেয়।

ভালো হয় ঠিকই। তবে সেরকম সাপের দাম খুব চড়া। সাপুড়েরা সহজে বিক্রি করতে চায় না। খেলা দেখায়। বিষ বিক্রি করে তাই বাধ্য হয়ে একটু পুরনো সাপ কিনি।'

হরিহর নাগ সম্বন্ধে দীপকের শ্রদ্ধা হল। ভদ্রলোকের বাইরের আবরণ রুক্ষ হলেও সত্যি জীবপ্রেমী। গ্রামের লোক একে অপছন্দ করে কেন? হয়তো

ভদ্রঘরের ব্যক্তির সাপ নিয়ে ঘাটাঘাটি পছন্দ নয়। আর একটা কারণ হতে পারে, হরিবাবুর সঙ্গী কালুয়া। ওর হাবভাব দীপকেরও ভালো লাগেনি।

দীপক ভাবল যে হরিবাবু ইন্টারভিউ না দিলেও ওঁর সম্বন্ধে নিউজ ছাপলে তো আটকাতে পারেন না। সে অধিকার আছে সাংবাদিকের। অতএব হরিহরের গতিবিধি কাজ ইত্যাদির খোজ আরও নিয়ে সে খবর ছাপবে বঙ্গবার্তায়। আশেপাশের গ্রামের লোক আর সাপুড়েদের থেকে শুনতে হবে হরিহরবাবুর সম্পর্কে।

তিন

দিন সাতেকের মধ্যে দীপক হরিহর নাগের বিষয়ে বেশ কিছু খবর পেল। বিচিত্র সব খবর।

নানান গ্রামের সাপুড়েরা জানাল যে হরিবাবু তাদের কাছে অনেক কিছু জানতে আসেন বটে। সাপুড়েদের জীবনযাত্রা। সাপ নিয়ে তাদের বিশ্বাস, পালাপার্বণ। সাপেদের রকমসকম। খাতায় লিখে নেন কী সব। প্রায়ই সাপ কেনেন। তবে ছোট সাপ কেনেন না। বড় বড় সাইজের সাপ কেনেন। বিষধর বা নির্বিষ যে কোনো সাপ। সাপ কে নিয়ে বড় দরাদরি করেন। কেনেন যথাসম্ভব কম দামে। ফলে পুরনো নির্জীৰ সাপই মেলে বেশি।

শুনে খারাপ লাগল দীপকের। হরিবাবু দীপককে যা বলেছিলেন তার সঙ্গে মিলছে না।

যে কাজের ধারা। এতে হরিহরের সাপ কেনার প্রধান উদ্দেশ্যটাই যে বার্থ হয়ে যাচ্ছে। ভদ্রলোকের কি অর্থের অভাব? অথবা কিপ্টে স্বভাব?

হরিহর যে গ্রামে বাসা বেঁধেছেন সেখানে খোঁজ করেও বিচলিত হয়। দীপক। গায়ের বেশির ভাগ লোক এই আগন্তুকের ওপর মহাখাল্লা হয়ে উঠেছে।

অন্য জায়গা থেকে সাপ এনে এই গাঁয়ে ছাড়বে—এইসব বন খেয়াল চলবে না। গায়ে বিষাক্ত সাপের অভাব নেই। প্রতি বছরই দু-একজন কামড় খায় বিষধরের। মারাও যায় কেউ কেউ। তার ওপর এই বাড়তি উপদ্রব কেন? গ্রামের লোক এই নিয়ে হরিহরকে ধমকেছে।

হবিহর নাকি বুঝিয়েছেন তাদের। তিনি এই গাঁয়ে বাইরে থেকে আনা সাপ কখনও ছাড়বেন না। সেগুলি ছেড়ে দেবেন গ্রামের সীমানা থেকে অনেক দূরে। গ্রামের লোক কিন্তু বিশ্বাস করেনি তার কথায়।

এই গ্রামের লোকের আর একটা ক্ষোভ কালুয়াকে নিয়ে। বেপরোয়া ধরনের লোকটা গাঁয়ের কাউকে যেন গ্রাহ্য করে না। ইতিমধ্যে ওর সঙ্গে গাঁয়ের লোকের ছোটখাটো খিটিমিটি হয়ে গিয়েছে। কালুয়ার গতিবিধি অতি সন্দেহজনক। রাতবিরেতে নিঃশব্দে কোথায় যায় আসে? লোকটা যে সুবিধের নয় তার প্রমাণ মিলেছে। এখানকার থানা থেকে পুলিশ এসে কালুয়ার খোঁজখবর নিয়ে গিয়েছে। জানা গিয়েছে লোকটা নাকি লাভপুরে বছরখানেক আগে একটা ডাকাতির কেসে ফেঁসেছিল। বরাতজোরে প্রমাণ অভাবে সেবার ছাড়া পায়। তবে মারপিটের অভিযোগে বারককে অল্পকালের জন্য জেল খেটেছে। বোলপুর থানা ওর ওপর তাই নজর রেখেছে। এমন একটি কুখ্যাত সঙ্গী জেটািলেন কেন হরিবাবু?

গ্রামের লোক মনিব-ভূত উভয়ের ওপরই সতর্ক চোখ রাখছে। বেচাল দেখলেই তাদের তাড়িয়ে ছাড়বে।

ভদ্রলোকের ভবিষ্যৎ ভেবে শঙ্কিত হয় দীপক। বেইজ্জত না হন। ওঁকে সাবধান করে দিলে হয়।

দাসপুর গিয়েছিল দীপক এক বন্ধুর শছে। কথায় কথায় বন্ধুটি বলল, 'কাল এক কাণ্ড হয়েছে। হরিহর নাগ নামে এক ভদ্রলোক এসেছেন এ-তল্লাটে। নাম শুনেছিস?

‘হ্যা, শুনেছি। কেন?”

হরিহরবাবু নাকি সাপ পোষেন। সাপ নিয়ে রিসার্চ করেন। ‘হা, শুনেছি।'

ওঁর একটা চাকর আছে কালুয়া নামে। কাল যা ঘটেছে, গায়ের লোক কলুয়ার ওপর সাংঘাতিক চটে গিয়েছে।'

'কালুয়াটা ঘোষদের আমবাগান থেকে একটা মস্ত ঢ্যামনা সাপ ধরে নিয়ে গিয়েছে লুকিয়ে।'

"ঢ্যামনা ধরল কী করে! যা ছোটে।

‘সাপটা ব্যাঙ-ট্যাঙ কিছু খেয়ে নিজবে হয়ে পড়েছিল। নড়তে পারছিল না। সেই সুযোগে ধরেছে। আমবাগানটা গ্রামের সীমানায়। কালুয়া ওর ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল দুপুরে।

তখন ধরে। একটা বাগাল ছেলে আগেই দেখেছিল সাপটা খাবার গিলে পড়ে আছে বাগানে। ছেলেটা দূর থেকে দেখে, কালুয়া ওখানে বসে কী জানি করল। তারপর চলে গেল। একটু বাদে বাগালটা গিয়ে দেখে সাপটা নেই। নির্ঘাৎ কালুয়ার কীর্তি। ওর মনিবকে দেবে।”

বন্ধুটি উত্তেজিতভাবে বলে, “ঢ্যামনা সাপ চাষির উপকারী জীব। ধেড়ে ইদুর খায় প্রচুর। ধেড়ে ইদুর কত ধান খেয়ে লোকসান করে চাষির। গায়ের লোক পারতপক্ষে ঢ্যামনা সাপ মারে না।'

‘হরিবারও মারবেন না। উনি সাপ এনে কিছুদিন রেখে অবসার্ভ করেন। তারপর ছেড়ে দেন।' দীপক ঠান্ডা করার চেষ্টা করে।

বন্ধুটি তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে, “ওঃ, এ গায়ের সাপ অন্য কোথাও ছাড়লে আমাদের লাভ? গ্রামের লোক ঠিক করেছে কালুয়া ফের এখানে এলে ওর ঠ্যাং ভেঙে দেবে।'

দীপকের মনে নানান প্রশ্ন ঘোরে। ব্যাপারগুলো কেমন গোলমেলে?

সিয়েনের কাছেই জমির সাপুড়ের বাড়ি। জমিরের সঙ্গে দীপকের বহুদিনের চেনা। জমিরের ছেলের অসুখে খুব সাহায্য করেছিল দীপক। দশ বছরের মরমর ছেলেকে বোলপুর হাসপাতালে ভর্তি করতে এনে জমির তখন দিশেহারা। দীপক চটপট রোগীকে হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করে। টাকাকড়ি দিয়ে সাহায্য করে জমিরকে। ক্রমে ছেলেটি সুস্থ হয়ে ওঠে। অনেকদিন বাদে দীপককে দেখে জমির ভারি খুশি। চা খাওয়ায়। এটা সেটা কথার পর দীপক জিজ্ঞেস করে, হরিহর নাগকে চেনো?” “আজ্ঞে চেনা হয়েছে।'

তার কাছে সাপ বিক্রি করেছ?”

করিছি বাবু।

কী কী সাপ?”

"সে হরেক রকম।

"উনি কি সাপ পোষেন?"

হ, তাই বলেন।

তুমি গেছ ওর বাসায়?"

"আজ্ঞে গেছি।"

'হরিবাবুর চাকর কালুয়া লোকটা কেমন?

দীপক লক্ষ করে যে জমির থতমত খায়। মুখে ত্রস্ত ভাব। সে জবাব দেয় না সঙ্গে সঙ্গে। খানিক চুপ করে থাকে। তারপর বলে, 'জানি না ঠিক।

দীপক বলল, 'ভাবছি এখন একবার হরিহরবাবুর বাসায় যাব। কেমনভাবে সাপ রাখেন, কী কী করেন দেখব। যাবে নাকি সঙ্গে?"

জমির কাচুমাচুভাবে বলে আজ একটু কাজ আছে।' তারপর সে ইতস্তত করে বলে, 'ওসব জিনিস দেখার দরকার কী? মা মনসার বাহন। ওদের মতিগতি বোক দায়। বড় মেজাজি জীব। শেষে বিপদ আপদ'—বলতে বলতে সে হঠাৎ থেমে যায়।

দূর, বিপদ আবার? যাক, চলি এখন। দীপক রওনা দেয়।

চার

বেলা দুপুর। হরিহর নাগের বাসায় পৌঁছে দীপক দেখল যে বাড়ি বন্ধ। দরজায় তালা ঝুলছে। সে ঘরগুলোর দরজা জানলার কপাট ঠেলে ভিতরে উকি মারার চেষ্টা করতে লাগল। একটা ছোট ঘরের জানলা দেখল আধখোলা। সে ঘরের মধ্যে নজর করে। | ভিতরে আলো নেই। তবে বাইরে ঝা ঝা রোদ। তারই ফলে ভিতরটা মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। ঘরে টাঙানো দড়িতে কী যেন ঝুলছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে দীপক। একটা বিশ্রী গন্ধ ভেসে আসে ঘর থেকে।

দীপক পরীক্ষা করে প্রতিটি জানলা দরজা। নাঃ, কোনোটাই খুলতে পারা যায় না। সে ভাবে কিছুক্ষণ। তারপর খানিক দূরে একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে

লুকিয়ে বসে।

চারপাশে ঘন গাছগাছালি থাকায় সরকারবাড়িটা বাইরে থেকে ভালো দেখা যায় না। দীপকের পিছনে একটা ভাঙা গোয়ালঘর, সামনে কুলকোপ। সাবধানে সে দেখে নেয় চারধার। জায়গাটা সাপখোপের আড্ডা। বাগান ভেদ করে বাসায় ঢোকার পথটা রইল তার নজরে। আশা করলে তাকে কেউ দেখতে পাবে না।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি দীপককে। কালুয়া ফিরল। সে ঘরের তালা খুলে ভিতরে ঢুকল। তারপরই একটা ছোট থলি হাতে বেরিয়ে গেল গ্রামের দিকে। মনে হল কিছু কিনতে গেল দোকানে। দরজায় তালা দিল না। শিকল তুলে দিল। অর্থাৎ এখুনি ফিরবে।

দীপক কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে। হরিহরের দেখা নেই। তিনি বোধহয় পরে ফিরবেন। আলাদা বেরিয়েছেন। কালুয়া ফেরার আগে সময়টুকু কাজে লাগাই। হয়তো এমন সুযোগ আর মিলবে না। দীপক শিকল খুলে বাসায় ঢুকল। এঘর ওঘর করে ঢুকল গিয়ে সেই ঘরটায়। দড়িতে ঝোলানো বস্তুটি পরীক্ষা কাল। বিশ্রী গন্ধটায় গা গুলিয়ে উঠছে। তাকে রাখা অনেকগুলো ছোটবড় সাপের ঝাপি। একটা বাঁশের লাঠি খাড়া করা রয়েছে দেওয়ালে। সেটা হাতে নেয়। এবার তার চোখ পড়ে ঘরের এক কোণে দুটো কাঠের প্যাকিং বাক্স। এক একটা হাত দেড়েক লম্বা, হাতখানেক চওড়া। তাদের ওপর কাঠের আলগী তক্তা চাপিয়ে ঢাকা দেওয়া।

ডান হাতে লাঠিটা দৃঢ় মুষ্টিতে পাকড়ে বাঁ হাতে একটা বাক্সের ডালা তুলেই চমকে যায়। দীপক। ও, এই ব্যাপার। সে তাহলে ঠিকই সন্দেহ করেছিল।

পিছনে খুট করে আওয়াজ হতেই দীপক চকিতে ঘুরে দাঁড়ায় লাঠি বাগিয়ে। কালুয়া ফিরেছে নিশ্চয়।

কিন্তু যে দৃশ্য দেখল, কাঠ হয়ে গেল সে।

কালুয়া নয়। স্বয়ং হরিহর নাগ দাঁড়িয়ে দরজায়। তার হাতে উদ্যত পিস্তল। কঠোর মুখ। চোখে তীব্র রাগ।

'লাঠিটা ফেল, কঠিন কণ্ঠে আদেশ করেন হরিহর, নইলে গুলি করব! সাইলোর লাগানো আছে রিভলবারে। কেউ শুনতে পাবে না। তারপর লাশ পুঁতে দেব

মাটিতে।

দীপক লাঠি ফেলে দেয়। হরিহরের হিংস্র মূর্তি দেখে বিশ্বাস করে যে, ও যা বলছে তা করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না।

এবার পিছনে ফের।' আদেশ হয়। দীপককে ইতস্তত করতে দেখে খুব ঠান্ডাভাবে হরিহর রিভলবার তাক করেন ওর কপাল লক্ষ্য করে। নিরুপায় দীপক পিছন ফেরে। 'কালুয়া, ওকে বেঁধে যে। হরিহরের কণ্ঠে হুকুম হয়।

সঙ্গে সঙ্গে দুটো প্রচণ্ড বলশালী থাবা দীপকের হাত দুটো টেনে পিছনে এনে সড়ি জড়িয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেলে। তারপরই তাকে ল্যাং মেরে মেঝেতে শুইয়ে দেয় কালুয়া। এবার বাঁধে তার পা।

'একদম চুপ। পালাবার চেষ্টা করলেই মরবে।'' হরিহর দীপকের বুকের ওপর রিভলবার তাক করে শাসায়।

দীপকের হাত-পা বাঁধা হলে কালুরা দীপককে মেঝেতে শুইয়ে রেখে বেরিয়ে যায়। দ্রুত ফিরে আসে। ফিরেই সে একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে। দীপকের নাকটা জোরে টিপে ধরে দু আঙুলে। নিঃশ্বাস নিতে বাধ্য হয়ে দীপক হাঁ করতেই কালুয়া তার মুখের মধ্যে ঠেসে দেয় একদলা ন্যাকড়া। দীপকের দমবন্ধ হওয়ার জোগাড়। সে ছটফট করে। কালুয়া নাক ছেড়ে দেয় বটে,তবে ঝটপট নিপুণ হাতে ওর মুখ বেঁধে ফেলে গামছা জড়িয়ে। দীপকের আর টু শব্দ করার উপায় থাকে না। শতর চোখে দেখে। বোঝে না এদের মতলবটা কী?

কালুয়া, আমাদের কোনো বিষওলা সাপ আছে?' হরিহরের প্রশ্ন। 'আছে। একটা কেলে গোখরোর বিষ জমেছে দাঁতে।'

''ভেরি গুড়। দু-একটা এমন থাকা দরকার। কাজে লাগে।

এবার দীপকের উদ্দেশে তীক্ষ্ণ বিদ্রুপের সুরে ক্রুর হেসে বললেন হরিহর, কীহে ইয়ংম্যান। রিপোর্টারি ছেড়ে ডিটেকটিভগিরি ধরলে কেন? এ গ্রেট ফুল। বড্ড বেশি জেনে ফেলেছ। তাই মরবে। নাগের লেজে পা দিয়েছ। ছোবল খেতেই হবে, উপায় নেই।"

তিনি এবার কালিয়াকে বললেন, 'শোন আমি বেরিয়ে যাচ্ছি এখুনি। বাসে বোলপুর শহরে যাব। কয়েকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে রাতে ওখানেই কাটাব গেননা হোটেলে। সকালে ফিরব। আমি চলে যাওয়ার খানিক বাদে তুই গোখরোটাকে ছেড়ে দিবি এই ঘরে। তারপর বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিবি। এরপর বাইরে থাকবি। উঠোনে গুৰি, কাজক করবি, দু-একবার গ্রামের ভেতরে যাবি। কে থাকে এসে লক্ষ করবি সাপটা একে কামড়াল কিনা। ছেলেটা অক্কা গেলে লাশ রাতের অন্ধকারে তুলে নিয়ে গিয়ে ফেলে আসৰি যতটা সম্ভব দূরে ধানখেতে। সাবধান, কেউ যেন না দেখতে পায়। ফেলার আগে এর ধাধন-টাধন সব খুলে দিবি। দেখে যেন মনে হয় আলপথে সাপে কেটে মরেছে।”

লাশ ফেলে এসে তুইও বেরিয়ে যাবি। ফিরবি একদম ভোরে। হ্যা, কালই সব মান পাচার করে ফেলতে হবে। সন্দেহ করে সার্চ করলে যেন কোনো প্রমাণ না পায়। সাপ কামড়াতে বেশি দেরি করলে জানলা দিয়ে ঢিল মেরে উসকে দিবি। তবে তাড়া নেই। এখন

চারটেও বাজেনি। ঢের সময় আছে।' নির্দেশগুলো দৃঢ় স্পষ্ট ভাষায় জারি করে দীপকের দিকে আর দৃপতি মাত্র না করে বেরিয়ে গেলেন হরিহর নাগ। কালুয়াও সঙ্গে গেল।

কালুয়া ফিরে এল মিনিট দশেক বাদে। সে তাক থেকে একটা ঝাপি নামিয়ে মাটিতে রাখল। তারপর ঝাপির ডালা তুলে একটু ফাক রেখে চট করে পিছিয়ে গেল।

কালো কুচকুচে এক সাপের মাথা সেই ফাকটুকু দিয়ে ভালা ঠেলে বেরুতে শুরু করে। তার মুখ থেকে সকলকে চেরা জিভ বেরুচ্ছে আর ঢুকছে। কালুয়া দ্রুতপায়ে ঘরের বাইরে গিয়ে দরজার কপাট বন্ধ করে। বাইরে শিকল তোলার শব্দ হয়।

ধীরে ধীরে বেরোয় সাপটা। অন্তত হাত চারেক লম্বা, তেমনি মোটা! চকচকে নিকষকালো দেহ। সেটা চলতে শুরু করে।

দীপক একেবারে কাঠ। সে জানে যে সাপ খাদ্যবস্তু ছাড়া অন্য প্রাণীকে নেহাত ভয় না পেলে অথবা বিরক্ত না করলে আক্রমণ করে না। দীপক বুকের ওঠানামা, শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ও গতি কমিয়ে আনে প্রাণপণে। যতক্ষণ এইভাবে বাঁচা যায়।

হাত পিছমোড়া করে বাঁধা থাকায় দীপক কিছুটা কাত হয়ে শোয়া। তার পায়ের দিকে দরজা। সাপের ঝাপিটা সামনে। খোলা জানলাটা পিঠের দিকে।

সাপটা একবার ঘাড় তুলে দেখে নেয়। অতঃপর ধীরেসুস্থে এঁকেবেঁকে চলে দেওয়াল ঘেঁষে। বোধহয় ও কোনো ফুটোর সন্ধান করছে বেরিয়ে পালাবার ধান্দায়। দীপকের অস্তিত্ব হয়তো টের পায়নি অথবা বিপজ্জনক মনে হয়নি এখনও। সারা ঘরে চকর দিতে থাকে সাপটা।

দীপক আড়চোখে নজর রাখছে সাপটাকে। কখনও সেটা তার কাছাকাছি চলে আসছে। কখনও দূরে। ইচ্ছে করে নয়, স্বাভাবিক আতঙ্কেই অবশ হয়ে যাচ্ছে দীপকের দেহমন। সাপটা যখন তার পিছন দিকে যাচ্ছে তখন যে রী অসহনীয় অবস্থা! প্রতি মুহুর্তে আশঙ্কা এই বুঝি ছোবল খেলাম। স্পর্শ পাব কোনো হিমশীতল সরীসৃপ দেহের। কোথায় ওটা? নড়াচড়া বা মুখ ঘুরিয়ে দেখার উপায় নেই। একইভাবে স্থির হয়ে থাকে সে।

জানলাটা দিয়ে আলো ঢুকছে। মাঝে মাঝে ছায়া পড়ছে হারে। কেউ নিশ্চয়ই জানলায় দাঁড়াচ্ছে, তোদর পথ আগলে। আবার সরে যায় ছায়া। কালুয়া লক্ষ রাখছে সাপটা দীপককে ছোবল দিল কিনা।

দীপকের মনে ভেসে ওঠে অনেক প্রিয়জনের মুখ-বাবা-মা দাদা-বউনি। ভাইপো ছোটন। ভাইঝি ঝুমা। আরও কতজনের। ঘরে থাকলে বউদি এই সময় তাকে চা খেতে ডাকত। দাসুর রেস্টুরেন্টের আড্ডায় একটু পরে এক এক করে বন্ধুরা জুটতে শুরু করবে। চা খেয়ে দীপকও হাজির হত। বঙ্গবার্তা অফিসে কুপ্রবাবু টেবিলে ঝুঁকে সম্পাদকীয় লিখছেন। হয়তো আশা করছেন দীপককে।

কেউ কি কল্পনাও করতে পারবে দীপক এখন কোথায়? নিশ্চিত মরণের মুখে কি যন্ত্রণাময় ভবিতব্যের প্রতীক্ষায় রয়েছে সে। সময় বুকি আর এগোয় না। কতক্ষণ কেটেছে। পনেরো মিনিট? আধ ঘন্টা? দীপকের বোধ হচ্ছে যেন কয়েক ঘণ্টা।

মনের চাপ অসহ্য হয়ে ওঠে এক এক সময়। সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত ঘুরছে চারপাশে।

রয়েসয়ে খেলাচ্ছে যেন উৎকট উল্লাসে। সে এর চেয়ে তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাক নীল, দিক ছোবল। আর সহ্য হয় না।

আবার একটা মরিয়া চিন্তা মাথায় খেলে। এভাবে হাল ছেড়ে দিয়ে নিজেকে সঁপে দিই কেন মৃত্যুর কবলে? শেষ চেষ্টা করা যাক। হঠাৎ যদি বাঁধা জোড় পায়ের নিচে চেপে ধরতে পারি সাপটার মাথা থেতলে পিষে নিই ওর মুন্ডুটা। যদি ফস্কাই মরব। সে তো এমনিতেও এড়ানো যাবে না। কিন্তু যদি সফল হই, তখন হাত-পায়ের বাঁধন খোলা অসম্ভব হবে না। জানলার গরাদ ভেঙে বের। লাঠিটা রয়েছে ঘরে। লুয়া বাধা দিলে মোকাবিলা করা যাবে। মোট কথা, এই একমাত্র উপায়। কালুয়ার কাছে নিশ্চয় পিস্তল নেই। সাপটার অজান্তে ধীরে অতি ধীরে উঠে দাঁড়াতে হবে। তারপর সাপটা কাছে আসার অপেক্ষা। নির্ভুল নিশানায় লাফিয়ে পড়তে হবে ওর মাথায়। দীপকের সমস্ত স্নায়ু টান টান। ইঞ্চি ইঞ্চি করে সে মাথা তুলতে থাকে মেঝে থেকে।

সহসা বাইরে একটা আওয়াজ হল জোরে। কী ব্যাপার? দীপক স্থির হয়ে যায়।

একটু বাদে দরজায় শব্দ হয়। শিকল খুলছে কেউ। পলকে সাপটা দরজা লক্ষ্য করে ফণা ধরে শ্রিংয়ের মতো খাড়া হয়ে ওঠে। দীপক তৎক্ষণাৎ মেয়ে শুয়ে ফের নিথর হয়। নির্ঘাৎ কালুয়া এসেছে।

পাঁচ

দরজার কপাট খুলে যায়। যে মুখটা উকি দিল, তাকে দেখে দীপক থ। কালুয়া নয়। আমির। তার হাতে লম্বা লাঠি। সতর্ক চোখে জমির সাপটাকে নজর করে। এক পা ঢোকে ঘরে। কুদ্ধ বিষধর সঙ্গে সঙ্গে সে তেড়ে যায় জমিরকে। মুহূর্তে লাঠির ঘা পড়ে সাপটার ঘাড়ে। ছিটকে যায় সাপটা। পরপর আরও কয়েক ঘা প্রচণ্ড আঘাতে জমির শেষ করে দেয় সাপটাকে। জমিরের পিছনে আরও একজন ঢোকে ঘরে। বসির। জমিরের ভাই।

জমির চটপট দীপকের হাত-পা-মুখের বাঁধন খুলে দেয়। আকুল স্বরে জিজ্ঞেস করে, সাপটা কি কেটেছে?”

না। দীপক মাথা নাড়ে। ‘ওঃ, বাঁচলাম, আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠে জমির, ভাবছিলাম বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে।'

দীপক উঠে বসে হাঁপায়। অবিশ্বাস্য চোখে দেখে মুত সাপটা। কী যে ঘটে গেল ঠিক ঠাহর হয় না। তারপর প্রশ্ন করে জমিরকে, 'তুমি এখানে?'

‘আপনি চলে যাওয়ার পর খেয়াল হল, আপনাকে যেতে দেওয়া ঠিক হয়নি। এর দুষ্ট লোক। যদি বিপদে পড়েন? তাই বসিরকে সঙ্গে নিয়ে এলাম আপনার পিছু পিছু। দূর থেকে দেখলাম, আপনি সরকারবাড়ির বাগানে ঢুকলেন। কালুয়া এল। হরিবাবু এলেন। হরিবাবু বেরিয়ে গেলেন। কালুয়া ঘোরাফেরা করছে। কিন্তু আপনার দেখা নেই। বাড়ি থেকে বেরুবার তো একটাই পথ। দু'জনে গিয়ে বাগানে লুকোলাম। দেখলাম কালুয়া থেকে থেকে একটা জানলা দিয়ে দেখছে ভেতরে। সন্দেহ হল। কালুয়া এবার গায়ের দিকে যেতেই গিয়ে উঁকি দিলাম ওই জানলায়। দেখলাম আপনি মেঝেতে পড়ে আছেন মরার মতো আর সাপটা ঘুরছে। ভয়ে হিম হয়ে গেল বুক। বসিরের সঙ্গে যুক্তি করলাম। একটু বাদে কালুয়া ফিরল। ওকে পিছন থেকে এক ঘা দিয়ে পেড়ে ফেলে বেঁধে ফেললাম। তারপর ঢুকলাম এই ঘরে।'

ওই বাক্সটা দেখ।' দীপক একটা কাঠের বাক্স দেখায়। ডালা খোলা বাক্সে ঝুঁকে দেখে জমির নীরবে মাথা ঝাকায়। ‘ওই বাক্সটা খোল। দ্বিতীয় কাঠের বাক্সটা দেখায় দীপক। সে নিজেও ওঠে।

জমির বাক্সের চাপাটা তুলতেই দীপক দেখে অন্য বাক্সটার মতো এটাও প্রায় ভর্তি সাপের চামড়ায়। নুন মাখানো শুকনো চামড়া। আঁশটে বোটকা গন্ধ ঠেলে ওঠে বাক্স থেকে।

দুটো বাক্স এবং ঘরে দড়িতে টাঙানো মস্ত একটা সাপের চামড়া দেখিয়ে দীপক জিজ্ঞেস করল জমিরকে, তুমি জানতে এরা সাপ মেরে চামড়া ছাড়িয়ে নেয়?' 'জানতাম বাবু।

বিলোনি কেন? সাপের চামড়ার ব্যবসা বেআইনি, জানতে না? সাপের দামি চামড়ার লোভে গাদা গাদা সাপ মারা হচ্ছিল। অনেক জাতের সাপ শেষ হয়ে যাচ্ছিল। সরকার তাই আইন করেছে সাপ মেরে চামড়া বিক্রি নিষিদ্ধ।

জমির কাচুমাচুভাবে বলে, 'আজ্ঞে জানতাম। বলতে পারিনি ভয়ে।

'কীসের ভয়?'

‘একদিন এখানে হঠাৎ এসে দেখি পিছনের উঠোনে দড়িতে অনেকগুলো সাপের চামড়া শুকাচ্ছে। বুঝতে পারি, এই এদের ব্যবসা। চলে আসার আগেই

কালুয়ার চোখে পড়ে যাই। ও শাসায়, কাউকে বললে আমায় খুন করবে। লোকটা সাংঘাতিক। তাই ভয়ে মুখ বুজে থাকি। আমি ছাড়া বোধহয় আর কেউ টের পায়নি। তবে বাবু আমি অকৃতজ্ঞ নই। আপনার বিপদ বুঝে আর স্থির থাকতে পারিনি।'

হাতে-পায়ে বাধনের জায়গাগুলো টনটন করছে। ম্যাসেজ করে আড়ষ্টতা কমিয়ে দীপক বাইরে আসে। বারান্দায় একটা খুঁটিতে কালুয়া মোক্ষম করে বাঁধা। তার মাথার পিছনে এক জায়গায় রক্ত গড়াচ্ছে। লোকটার চোখ-মুখ বিকৃত হয়ে উঠেছে হিংস্র রাগে।

শান্ত সুশীল জমিরেরও দেখা গেল ভিন্ন মূর্তি। দাঁত কিড়মিড় করে চাপা গনি ছাড়ে, বসির, একটা বিষে টইটম্বুর কালনাগ নিয়ে আয় দিকি। শয়তানটার গায়ে ছেড়েদি। সাপের বিষে মৃত্যু কেমন আরাম টের পাক।

‘‘থাক, থাক’, দীপক থামায়, এসো।'

খানিক তফাতে গিয়ে দীপক বলল, কালুয়া যেমন আছে থাক। এক্ষুনি বোলপুর যেতে হবে। থানায়। জমির, তুমি আমার সঙ্গে চলো। বসির এখানে কলয়াকে পাহারা দিক। বাস, লরি, প্রাইভেট কার যা পারি ধরে চলে যাব। টের পেলেই হরি নাগ পালাবেন। উনিই আসল শয়তান। আজ রাতের মধ্যে দুটোকে অ্যারেস্ট করানো চাই।।

বাস রাস্তায় পৌঁছে দীপক দেখল যে বাস-স্টপে হরিহর নেই। অর্থাৎ উনি বোলপুর রওনা হয়ে গিয়েছেন। যাক, নিশ্চিন্তি।

দুদিন বাদে। সকালে বঙ্গবার্তা অফিসে হাজির হল দীপক।

কুঞ্জবিহারী চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দীপকের কাঁধ চাপড়ে দিয়ে হুঙ্কার ছাড়লেন, ‘কন্যাচলেশনস।' তিনি উত্তেজিত স্বরে বললেন, ‘খানিক আগে থানার বড়বাবুর সঙ্গে দেখা হল। উনি বললেন, কলকাতায় হরি নাগের গুদাম সার্চ করে প্রচুর সাপের চামড়া পাওয়া গিয়েছে। দেশে-বিদেশে চালান দিতেন গোপনে। এই কারবারে প্রচুর টাকা কামাতেন। ওঁর বিজনেস-পার্টনারকেও ধরেছে পুলিশ। এই লোভীগুলোর জন্যে কত প্রাণী যে লোপ পেতে বসেছে! এদের শাস্তি আরও কঠোর হওয়া উচিত।'

দীপক বসতে, কুঞ্জবাবু প্রশ্ন করলেন, বলো তো বাপু, কীভাবে সন্দেহ করলে কেসটা? সেদিন তোমায় টায়ার্ড দেখে ডিটেলস জিজ্ঞেস করিনি।'

দীপক বলল, "গ্রামের লোকের কথায়। শুধু বুড়ো আর বড় সাপ কেনেন। এদিকে হরি নাগ মুখে বলেন অন্যরকম। বড় ঢ্যামনা সাপের অর্ডার দেন সাপুড়েদের। সাপ নিয়ে রিসার্চ করছে আর নির্বিষ ঢ্যামনা সাপ সম্বন্ধে গাঁয়ের লোকের সেন্টিমেন্ট জানেন না? স্ট্রেঞ্জ! আবার কালুয়ার মতো দাগি গুন্ডাকে সঙ্গী জুটিয়েছেন! খটকা লাগল। ভাবলাম, ওঁর সম্বন্ধে আরও খোঁজ নিই।'

ওই গাঁয়ের পোস্টমাস্টার আমার চেনা। তাকে বলে রাখলাম, হরিহর কোনো চিঠি পোস্ট করলে, কোথায় পাঠাচ্ছেন ঠিকানাটা টুকে রাখতে। তিন দিন বাদে ঠিকানা পেলাম। তাই দেখে চলে গেলাম কলকাতায়। ট্যাংরা অঞ্চলে। নাগ কোম্পানির অফিস-গুদাম বের করলাম। দেখি চামড়ার ব্যবসা। সন্দেহটা বাড়ল। তখন হানা দিলাম ওর ডেরায়। ভানে অ্যানিমাল লাভার। কী ধূর্ত। 'খুব বেঁচে গেছ। লোকটা ডেঞ্জারাস ক্রিমিনাল, কুঞ্জবিহারী মন্তব্য করেন।